গণিকা দর্শন

(প্রাপ্তমনস্কদের জন্য)

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিইবার ফিয়েরা

সূ চি প ত্র

মুখবন্ধ ৯
বেশ্যানাং পুরুষাধিগমে রতির্বৃত্তিশ্চ সর্গাৎ ১৩
গণিকা এবং চৌষট্টি কলার সমন্বয় ১৭
স্বর্গের বেশ্যা যাঁহারা = স্বর্গবেশ্যা ২১
গণিকাবৃত্তির এক করুণ রূপ বিষকন্যা ২৯
বাৎস্যায়নের চোখে গণিকা ৩৩
প্রাচীন সাহিত্যে গণিকা ৩৯
দেবদাসীর অন্য নাম গণিকা ৫১
প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক সাহিত্যে গণিকা ৬০
বাবুবিলাসীদের গণিকাযাপন ৬৫
ভারতের বাঈজি-সংস্কৃতি ও গণিকাবৃত্তি ৭২
ব্রিটিশ-ভারতে গণিকাদের সামাজিক অবস্থা ৮০
অন্য দেশ: প্রাচীন সভ্যতায় গণিকাবৃত্তি ৮৮
যাত্রা-থিয়েটার-চলচ্চিত্রে গণিকা ৯১
স্বাধীনতা সংগ্রামে গণিকা ১০০
গণিকাবৃত্তি নানা রূপে ১০৩
দেশে দেশে গণিকাবৃত্তি ১৬১
পুরুষ যৌনকর্মীর বাজার ২২৫
গণিকাবৃত্তির বিশ্ব-অর্থনীতি ২৪১
গণিকালয়ের নাম সোনাগাছি ২৪৬
উত্তরণ: বেশ্যা থেকে যৌনকর্মী ২৫২
পুরুষরা কেন যৌনকর্মীদের সাহচর্য চায় ২৬৭
বেশ্যাদ্বারের মাটি : গূঢ়তত্ত্ব ২৭৪
যৌনকর্মীরা কি বাধ্য হয়েই যৌনপেশায়? ২৭৭
গণিকাবৃত্তির অধিকারের লড়াই, নিশ্চয়তা, নিরাপত্তায় স্বেচ্ছাসেবী ২৮১
গণিকাগমন এবং গনোরিয়া, সিফিলিস ও এইডস ২৯৫

মুখবন্ধ

যৌনপেশা সাধারণত দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায় – (১) রেড লাইট এরিয়া এবং (২) নন-রেড লাইট এরিয়া। রেড লাইট এরিয়ায় মূলত বিক্রি হয়ে, পাচার ও প্রতারিত হয়ে আসা মেয়েরা বাধ্য হয়ে যৌনপেশায় যুক্ত থাকে। এঁরা সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। নন-রেড লাইট এরিয়ার গণিকারা স্বেচ্ছায় যৌনপেশা বেছে নেয়। অতিরিক্ত রোজগারের আশায় এ পেশায় আসে। এঁরা কেউ স্বাধীন, কেউ-বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে। এঁরা সমাজের মূলস্রোতে বুক ফুলিয়েই থাকে। চাকরির মতো সকালে সেজেগুজে বেরোয়, রাতে বাড়ি ফেরে।

গণিকাবৃত্তি বা বেশ্যাবৃত্তি বা যৌনপেশা আমাদের মনুষ্য সমাজে দুটি নজরে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। সর্বাপেক্ষা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিটি হল নোংরামি, অনৈতিক এবং দণ্ডনীয়। অর্থাৎ গণিকাবৃত্তিকে দেখা হয় পাপকর্ম বা পাপাচার হিসেবে। অপর দৃষ্টিভঙ্গিটি হল সেফটি ভালব, মানুষের যৌন অবদমন থেকে মুক্তিদাত্রী। নারীদের গণিকাবৃত্তিকে সেফটি ভালব হিসাবে দেখার কারণ বিবাহের সীমার মধ্যে যেসব পুরুষের অধরা যৌনবাসনা পূরণ হয় না, তাঁদের সেই কামনা চরিতার্থ করতেই সমাজে গণিকাবৃত্তির প্রয়োজন। গণিকারা যেন নীলকণ্ঠ, সমাজের পুরুষ-বিষ ধারণ করবে সে – এরকম একটা ট্যাবু।

অন্দরমহলে নারীর মূলত প্রধান দুটি ভূমিকা – একটি স্ত্রী, অন্যটি মাতা। দুটি সম্পর্কেই যত দ্বন্দ্ব! দুটি ভূমিকাই প্রজন্মের প্রজনন কর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রজনন প্রশ্নে অবশ্যই আসবে যৌনতা। যৌনতা বলতে গোদা বাংলায় অবশ্যই যৌনক্রিয়া বা ইন্টারকোর্স বোঝায়। যেহেতু নারীর যৌনতাকে কেবলমাত্র বিবাহের মাধ্যমেই বৈধতা দেওয়া হয়েছে, তাই বিবাহের মধ্যেই যৌনতাকে সংগঠিত করা হয়। বৈবাহিক জীবনে নারীর যৌনতা একটি গৃহস্থালী দায়িত্ব ও কর্তব্যে পর্যবসিত হয়ে যায়। স্বামীর যৌনক্ষুধা নিবারণ ও সন্তান উৎপাদনের জন্য উৎসর্গীকৃত নারী। স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্কে যদি স্ত্রীর কামনা-বাসনা কিছুটাও পরিতৃপ্ত হয়, তা সত্ত্বেও বিবাহ নামক এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে সন্তান উৎপাদন ও স্বামীর যৌনক্ষুধা নিবারণ করতে। নারীর যৌনক্ষুধার তৃপ্তি মিটুক বা না-মিটুক বংশরক্ষার কারণে নারীকে অবশ্যই যৌনকর্ম করতে হবে। পুরুষকেও কেবলমাত্র স্ত্রীর সঙ্গেই যৌনকর্ম করতে হবে। তবে পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ ছাড়া অন্য নারীর সঙ্গও পেতে পারে। বিশাল বাজার তাঁর জন্য খোলা আছে। চাইলেই বহুগামী মনকে বিকশিত করতে পারে। অথবা যৌন অবদমন থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক কারণে তেমন সুযোগ হয়তো কম। সেই কম সুযোগটাকেও অনেক সাহসী নারী কাজে লাগিয়ে থাকে। স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারী বা পুরুষের সঙ্গে যৌনাচার করতে সাহস তো লাগেই। তাই নারী যৌনকর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ যৌনকর্মীদের বাজারও আছে। দেহ বিক্রির বাজার না-নারী না-পুরুষদের জন্যেও আছে, যাঁদের আমরা সমকামী ও রূপান্তরকামী বলে থাকি।

বেশ্যানাং পুরুষাধিগমে রতির্বৃত্তিশ্চ সর্গাৎ

'পবিত্র' গণিকাবৃত্তি প্রাচীন প্রাচ্য দেশে বেশি মাত্রায় হত। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ানরা ধর্মীয় যৌনতার প্রতিটি সুযোগই কাজে লাগাত। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডটাস বলেন — ব্যাবলীয়ানদের সবচেয়ে খারাপ রীতি ছিল জীবনে একবার হলেও প্রত্যেক মহিলাকে বাধ্য করা হত আফ্রোদিতি মন্দিরে যেতে, যেখানে তাঁকে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে হত। যে সব মহিলারা ধনী ও বংশমর্যাদায় গর্বিত ছিলেন, তাঁরা মিলিত হতে চাইতেন না। তাঁদের তখন দড়ি দিয়ে বেঁধে আনা হত মন্দিরে। প্রচুর অনুগামী লোক ভিড় করত তখন। এভাবে বিপুল সংখ্যক মহিলাদের আনা হত। যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়ার আগে মহিলারা কখনোই বাড়িতে ফিরে যেতে পারতেন না। অপরিচিত কোনো লোককে অবশ্যই টাকা দিতে হত বন্দিনী মহিলার আঁচলে এবং তাঁকে আহ্বান করতে হত মাইলিত্তা দেবীর নামে। তাঁদের মন্দিরের বাইরে মিলিত হতে হত। টাকার পরিমাণ যাই হোক না-কেন, তা নিতে অস্বীকার করা পাপ মনে করা হত। এইভাবে সুন্দরী মহিলারা মর্যাদা খুইয়ে মুক্তি পেত অল্প দিনে। অসুন্দরীদের থাকতে হত দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত কোনো লোকের সঙ্গে যৌনমিলন না হওয়া পর্যন্ত। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৪ বছর আগে গ্রিসে জেনোফন নামের একজন অলিম্পিক বিজয়ী দেবীর মন্দিরে ১০০ জনের মতো তরুণীকে উপহার হিসেবে দান করে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। করিন্থ নামক ওই শহরে দেবী আফ্রোদিতির মন্দির ছিল। রোমান যুগে ওই মন্দিরে প্রায় হাজারের উপর দেবদাসী ছিল।

"বেশ্যানাং পুরুষাধিগমে রতির্বৃত্তিশ্চ সর্গাৎ" – বেশ্যাগণের পুরুষগ্রহণ প্রবৃত্তি বা পুরুষকে প্রলুব্ধ করা এবং অর্থার্জন সেই সৃষ্টিকাল থেকে চলে আসছে। এহেন ব্যাখ্যাই বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্রম্' গ্রন্থের চতুর্থ অধিকরণে অবহিত করেছেন। বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ অধিকরণটি বৈশিক বা বেশ্যাদের জন্যই বেশ গুরুত্ব সহকারে বরাদ্দ রেখেছেন। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে 'বেশ্যা' বিশেষণের বেশ কিছু সমতুল প্রতিশব্দ পাওয়া যায় পেশার ধরন হিসাবে। যেমন – পতিতা, বারাঙ্গনা, দেহপসারিণী, দেহপোজীবিনী, রূপোপজীবিনী, রক্ষিতা, খানকি, ছিনাল, বারবনিতা, উপপত্নী, জারিণী, সাধারণী, মহানগ্নী, পুংশ্চলী, পুংশ্চলূ, অতীত্বরী, বিজর্জরা, অসোগু, অতিক্কদ্বয়ী, গণিকা, গণেরুকা, নটী, হট্টবিলাসিনী এবং হাল আমলের 'যৌনকর্মী'। আমি যেহেতু আমার গ্রন্থের নাম 'গণিকা-দর্শন' রেখেছি, তাই গোটা গ্রন্থে যথাসম্ভব 'গণিকা' প্রতিশব্দটিই ব্যবহার করব। তবে ইংরেজিতে যেমন ডেমি মন্ডে, পাবলিক ওম্যান, হাটাইরাই, অ্যাসপাসিয়া ইত্যাদি শব্দের মতো আদিম ও প্রাগৈতিহাসিক বিশেষণ আছে, ঠিক তেমনি আধুনিক বিশেষণগুলি হল – হোর, প্রসটিটিউট, কল গার্ল, এসকর্ট ইত্যাদি।

মোদ্দা কথা, অর্থ বা পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে যে নারীরা একাধিক পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন বা

গণিকাবৃত্তির এক করুণ রূপ বিষকন্যা

মহাভারতের যুগে 'বিষকন্যা' নামক এক শ্রেণির সুন্দরী গণিকাদের কথা জানা যায়। এঁরা খুনে গুপ্তচর বাহিনীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল যৌনসম্ভোগকালে ওষ্ঠ-চুম্বনে অথবা দংশনে এরা হত্যার জন্য প্রেরিত ব্যক্তির শরীরে বিষ ঢেলে দিত। সেই ব্যক্তি জ্ঞান হারালে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করত এবং তাঁর পুরুষাঙ্গটিও কেটে ফেলা হত। মহাভারতের চতুর্দশ অধ্যায়ের বিষয়ই বিষকন্যা পাঠিয়ে গুপ্তহত্যা। শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য তাঁর 'মহাভারতের সমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন – "অনেক সময় শত্রুপক্ষ সুন্দর যুবতীকে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়া থাকেন। পরিমিত মাত্রায় বিষ হজম করাইয়া সেই সকল কন্যাকে এমনভাবে তৈয়ারি করা হয় যে, তাহাদের স্পর্শমাত্রই অপর প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। সেই সকল কন্যাকে 'বিষকন্যা' বলে। গুপ্তচরের মুখে সমস্ত বার্তা অবগত হইয়া অতিশয় সাবধানে বাস করিবে। এই সকল প্রলোভন হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিলে বিনাশ সুনিশ্চিত।"

শৈশবকাল থেকেই সুন্দরী কন্যাসন্তানদের শরীরে অল্প অল্প করে বিষ প্রয়োগ করে তাঁদের শরীরকে বিষ-সহনীয় করে তোলা হত। এই প্রক্রিয়াকালে অনেক কন্যাসন্তান বিষের প্রভাবে মারাও যেত। যাঁরা সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যেত, তাঁদের শরীর জুড়ে বিষের প্রবাহ। এইসব মেয়েরা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে উঠলে শত্রু কবজা করতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এঁরা শরীরী-ছলনায় কামুক পুরুষদের দখল নিত। যে পুরুষ যৌনকামকে জয় করতে পারত, তাঁকে কবজা করা জটিল হয়ে পড়ত। যে জয় করতে পারত না, তাঁর মৃত্যু অনিবার্য।

মোট কথা, ক্ষমতাবান শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য বিষকন্যা পাঠানোর রেওয়াজ ছিলই। মৌর্যযুগেও এমন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। নন্দরাজার এক মন্ত্রী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে বিষকন্যা পাঠিয়েছিল। চাণক্যের কুট-বিচক্ষণতায় সেই বিষকন্যাকে পর্বতক নামে এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পর্বতক বিষকন্যায় শরীরী ছলনায় আত্মসমর্পণ করলে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষে 'বিষকন্যা' গণিকাদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়েই। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশে বিষকন্যাদের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বিষকন্যার হদিস পাওয়া যায়। কল্কিপুরাণে সুলোচনা (সুলোচনা ছিলেন গন্ধর্ব চিত্রগ্রীবের স্ত্রী) নামে এক বিষকন্যার কথা জানা যায়। এইসব বিষকন্যার নজরে কোনো পুরুষ পড়লেই পুরুষটি মারা যায়।

তৎকালীন রাজারাও বিষকন্যাদের নিয়োগ করতেন শত্রুনিধনের স্বার্থে। এহেন বিষকন্যারা একদিকে যেমন বহুপুরুষগামী, অপরদিকে হত্যাকারী। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের নামে একটা গল্প প্রচলিত আছে। জিশুর জন্মের ৩২৭ বছর আগে এই আটাশ বর্ষীয় এক শক্তিশালী গ্রিক রাজার শৌর্যে তাঁর পায়ে অবনত হয়েছিল প্রায় অর্ধেক পৃথিবী। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল পশ্চিম ইউরোপ থেকে পারস্য পর্যন্ত। এই রাজা